অন্তবর্তীকালীন বনাম তত্ত্বাবধায়ক সরকার: কোন পথে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন?

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (০১ সেপ্টেম্বর, ২০১২)

গণতান্ত্রিক শাসন আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকার। সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে ....'। আর গণতান্ত্রিক যাত্রাপথের সূচনা হয় নির্বাচনের মাধ্যমে। তাই সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত, যদিও নির্বাচনই গণতন্ত্র নয়। বরং নির্বাচনসর্বস্ব তথাকথিত 'একদিনের গণতন্ত্র' – নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হলেও – গণতান্ত্রিক পদ্ধতির একটি বিকৃত রূপ মাত্র।

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ৪১ বছর পরেও আমরা সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের একটি কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করতে, এমনকি এব্যাপারে একটি ঐক্যমত্যও সৃষ্টি করতে পারিনি। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম দুই দশকের অধিকাংশ সময় সামরিক কিংবা আধা-সামরিক বাহিনী রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে। সে সময় বাংলাদেশের মানুষ দেখেছে ভোটারবিহীন নির্বাচন এবং নির্বাচনে হোণ্ডা-গুণ্ডার দৌরাত্ব। সে সময়কার নির্বাচিত সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোও ছিলো অনেকটা পক্ষপাতদুষ্ট।

গণ আন্দোলনের মুখে স্বৈরাচারী সরকারের পতনের পর প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সম্মতিতে, বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে একটি নির্দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে, ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক যাত্রাপথের পুনঃসূচনা হয়। জনগণ তখন আশায় বুক বেধেছিলো যে, রাজনৈতিক দলসমূহ ভবিষ্যত নির্বাচনগুলো নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের পথে বিরাজমান বাধাগুলো দূর করবে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুসংহত ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষে – তিনজোটের রূপরেখা – বাস্তবায়ন করাসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতাহীনতার সুযোগে এবং ক্ষমতাসীন দল বিএনপির পৃষ্ঠপোষকতায় ২০ মার্চ ১৯৯৪ অনুষ্ঠিত পক্ষপাতদুষ্ট নির্বাচন সে আশার গুড়ে বালি ছুড়ে দেয়।

এমনি পরিস্থিতিতে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে দাবি ওঠে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের। অবশেষে লাগাতার সংসদ বর্জন ও সহিংস আন্দোলনের মুখে এবং বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের পদত্যাগ ও একটি একতরফা নির্বাচনের পর, ২৪ মার্চ ১৯৯৬ তারিখে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংযোজিত হয়।

এরপর বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে। পরবর্তী দুটি নির্বাচনও দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষকদের মতে নিরপেক্ষ হলেও, যদিও প্রতিবারই বিজিত দল নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের পর কারচুপির অভিযোগ তুলেছে, ভবিষ্যতে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথ এখনও সুগম হয়নি এবং আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও অদ্যাবধি সুষ্ঠু ভিতের ওপর দাঁড়ায়নি। বরং গত দুই দশকের নির্বাচিত সরকারের আমলে আমাদের দেশে নির্বাচনসর্বস্ব একদিনের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু নির্বাচন পরবর্তীকালে আইনের শাসন, মানবাধিকার সংরক্ষণ, স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার চর্চা তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠার আশা সুদূর পরাহতই রয়ে গিয়েছে। সর্বস্তরে কার্যকর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে গভীরতা প্রদানের কোনো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগও এসময়ে গ্রহণ করা হয়নি।

এক কথায় বলতে গেল, গত দুই দশকে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে তেমন কোনো পরিবর্তনই আসেনি এবং আমাদের ভঙ্গুর ও অকার্যকর গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কোনোরূপ উৎকর্ষও সাধিত হয়নি। বরং এনায়কতন্ত্র ও পরিবারতন্ত্র আমাদের ওপর জেঁকে বসেছে, নির্বাচনে টাকার খেলা সর্বব্যাপী রূপ নিয়েছে এবং রাজনীতি হয়ে পড়েছে বহুলাংশে ব্যবসায়ীদের করায়ত্ব। দখলদারিত্ব, দলীয়করণ, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ইত্যাদির অনেকটা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে। বিচারপতি হাবিবুর রহমানের মতে, দেশ যেন এখন 'বাজিকরদের' হাতে।

উপরন্তু বর্তমান সরকার সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাদ দেওয়ার ফলে আমরা আবার পুরানো বিতর্কেই – তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ক বিতর্কেই ফিরে গিয়েছি, যদিও যে অবিশ্বাসের পরিবেশে এর প্রবর্তন হয়েছিলো তার কোনো গুনগত পরিবর্তনই হয়নি। অর্থাৎ ইতিহাসেরই যেন পুনরাবৃত্তি ঘটছে। প্রসঙ্গত, অতীতে আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার সংস্কারের কথা বললেও এটি বাতিলের কথা কখনো উচ্চারণ করেনি।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্কে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিবিসি'র 'হার্ড টকে' দেওয়া বিরোধী দলকে অন্তর্ভুক্ত করে অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাবের ফলে। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার আকাঙ্ক্ষা সামনে রেখে এ বিষয়গুলোর ওপর অলোকপাত করাই এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

আমাদের রাজনীতিতে তত্ত্বাবধায়ক বনাম অন্তবর্তীকালীন সরকার নিয়ে প্রায় দুই দশকের বিতর্ক থেকে কয়েকটি প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমত, যে দলই ক্ষমতায় থাকে, সেদলই সংবিধানের প্রতি পরম অনুরাগী হয়ে পড়ে এবং সংবিধান সমুন্নত রাখার ব্যাপারে অনড় অবস্থান নেয়। দ্বিতীয়ত, সব ক্ষেত্রেই সরকারি দল বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী বা নিজ দলের কারো নেতৃত্বে অন্তবর্তীকালীন বা সর্বদলীয় সরকার গঠনের পক্ষে অবস্থান নেয়। তৃতীয়ত, পক্ষান্তরে বিরোধী দল সর্বদাই নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে থাকে। চতুর্থত, ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী দলের এমন প্রেডিকটেবল অবস্থানের কারণ নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে হলেও ক্ষমতা আকড়ে ধরে থাকার এবং ক্ষমতা দখল করার অদম্য আকাঙ্খা। পঞ্চমত, আকড়ে ধরে থাকার জন্য সরকারি দল প্রশাসন-আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, নির্বাচন কমিশন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে জঘন্য দলীয়করণ এবং সংবিধানে চরম জনস্বার্থ বিরোধী সংশোধনী অন্তর্ভুক্ত করতেও দ্বিধাবোধ করে না। এমনকি প্রশাসনের শৃঙ্খলা ভাঙ্গতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। ষষ্ঠত, সরকারি দল ক্ষমতায় যাওয়ার পর আইন ও বিধি-বিধানের সংস্কার এবং নির্বাচন কমিশনকে সত্যিকারার্থে শক্তিশালী করাসহ নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথে বাধা দূর করার কোনো উদ্যোগ নেয় না। বরং তারা স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে (যেমন, লোক দেখানোর জন্য নির্বাচন কমিশন পুনঃগঠনের লক্ষে অনুসন্ধান কমিটি গঠন) বিভিন্ন খেলায় মত্ত হয়। তাই এটি সুস্পষ্ট যে, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর অনৈতিক, হীন স্বার্থ প্রণোদিত ও সুবিধাবাদী অবস্থানই আমাদের অকার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য মূলত দায়ী।

টেবিল-১: নির্বাচনকালীন সরকার সম্পর্কে প্রধান দুই দলের অবস্থান

সময়কাল	আওয়ামী লীগ	বিএনপি	মন্তব্য
মার্চ ১৯৯৬ সালের আগে	নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে	নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিপক্ষে এবং সংবিধান সমুন্নত রাখার ব্যাপারে অনমনীয়	নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে প্রধান দলগুলোর পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসের ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সব ধরনের সমঝোতা চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর সহিংস আন্দোলনের মুখে বিএনপি তা মেনে নিতে বাধ্য হয়।

১৯৯৪ সাল	বেগম খালেদা জিয়ার পরিবর্তে নির্দলীয় ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী করার শর্তে সম-প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের ব্যাপারে একমত হয়	বেগম খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী করার শর্তে সম-প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাব করে	স্যার নিনিয়নের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত সমঝোতা প্রচেষ্টায় উভয় দলই সম-প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সংসদের মেয়াদ শেষে অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রস্তাবে একমত হয়। কিন্তু কে প্রধানমন্ত্রী হবেন মূলত সে বিষয়ে মতানৈক্যের কারণে আলোচনা ভেঙ্গে যায়। পারস্পরিক অবিশ্বাসই যার মূল কারণ।
অক্টোবর ১৯৯৫	সরকার ও বিরোধী দল থেকে ৫ জন করে সংসদ সদস্যকে উপনির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত করে এনে (যারা পরবর্তী সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না) সর্বদলীয় সরকার গঠন, যার প্রধান হবেন একজন নিদর্লীয় ব্যক্তি	সরকার ও বিরোধী দল থেকে ৫ জন করে সংসদ সদস্যকে উপনির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত করে এনে (যারা পরবর্তী সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না) সর্বদলীয় সরকার গঠন, যার প্রদান হবেন হয় খালেদা জিয়া অথবা সরকারি দলের একজন	স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গ্রুপ অব ফাইভের (জি-ফাইভের) এ উদ্যোগ দলগুলোর পারস্পরিক অবিশ্বাসের কারণে সফল হয়নি। রাষ্ট্রপতিকে সর্বদলীয় সরকারের প্রধান করার প্রস্তাবও সরকারি দলের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়, যা বিরোধী দল মানেনি।
মার্চ ১৯৯৬	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবির সফল পরিণতি ঘটে	তত্ত্বাবধায়ক সরকার মেনে নেয়	ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যুক্ত হয়
মার্চ ১৯৯৬ থেকে মে ২০১১ পর্যন্ত	নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে	নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে	দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয় – প্রধান দলগুলোর মধ্যে এ ব্যাপারে এক ধরনের ঐক্যমত্য সৃষ্টি হয়
জুন ২০১১ পরবর্তীকালে	নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিপক্ষে এবং সংবিধান সমুন্নত রাখার ব্যাপারে অনমনীয়	নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে	নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে দুই প্রধান দলের অবস্থানে নাটকীয় পরিবর্তন
২০০৫-০৬ সালে	২২ জানুয়ারি ২০০৭ অনুষ্ঠেয় নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জন করে	নির্বাচন কমিশন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে চরমভাবে দলীয়করণ করে	গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে এবং সেনাবাহিনীর সমর্থনে নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান না থাকলে হয়ত সামরিক শাসন জারি হতো
জুন ২০১১	সুপ্রিম কোর্টের সংক্ষিপ্ত আদেশের প্রেক্ষিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল এবং সংসদের মেয়াদ হওয়ার আগের তিনমাসে সংসদ নির্বাচনের বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে	প্রবলভাবে এর বিরোধীতা করে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন না করলে পরবর্তী নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার ঘোষণা দেয়	সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চরম দলীয়করণ আরেকটি বড় বাধা।
আগস্ট ২০১২	সংবিধান সমুন্নত (অর্থাৎ পঞ্চদশ সংশোধনী বহাল) রেখে (সম্ভবত শেখ হাসিনার প্রধান মন্ত্রীত্বে) বিরোধী দলের অংশগ্রহণে সর্বদলীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব দেয়, যদিও বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্বের পরিমাণ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি	সর্বদলীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা দাবির প্রতি অনড় থাকে	বিবিসি'র হার্ড টক অনুষ্ঠানে দেওয়া প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব সম্পর্কে দুই দলের মধ্যে মূল মতানৈক্যের বিষয়: নির্বাচনকালীন সরকার দলীয়, না নির্দলীয় হবে? কোন দলের কত প্রতিনিধিত্ব থাকবে? সংসদের মেয়াদ শেষের আগে, না পরে নির্বাচন হবে?

সরকারি দল বিরোধী দলে গেলে এবং বিরোধী দল সরকারি দলের আসন অলংকৃত করলে তাদের অবস্থান, এমনকি ভাষাও যে বদলে যায় তার একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। পাঁচ বিশিষ্ট নাগরিকের সমঝোতা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরদিন আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী পরিষদ সিদ্ধান্ত নেয় যে, কেবল নির্দলীয়, নিরপেক্ষ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনই দেশকে সংকট থেকে মুক্তি দিতে পারে। আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী পরিষদের এই সভায় অতিসত্তর জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। (প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক, *জাতীয় সংসদ*, হাসান বুক হাউস, ২০১১, পৃ: ১৩২।) পরবর্তীতে ২৪ নভেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন: 'বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী কোন অনির্বাচিত কিংবা মনোনীত ব্যক্তির পক্ষে এখন আর দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়া সম্ভব নয়। দেশে এখন একটি নির্বাচিত সংসদ, ও একজন নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন। অথচ বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ ১৯৯০ সালের মত সরকার পরিবর্তন চান, প্রচলিত বর্তমান সংবিধানে যা কোনক্রমেই সম্ভব নয়।' (মাহমুদ সফিক, *জনগণ সংবিধান নির্বাচন* ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬, পৃ: ৯০।) বর্তমানে সরকারি ও বিরোধী দলও প্রায় একই ভাষা ব্যবহার করছে।

উল্লেখ্য, সংবিধানের তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা যুক্ত হবার পর এ নিয়ে হাইকোর্টে দুটি রিট মামলা হয়। প্রথম মামলায় বিচারপতি মোজাম্মেল হকের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে সাংবিধানিকভাবে বৈধ বলে ঘোষণা দেন। দ্বিতীয় মামলায় বিচারপতি মোঃ জয়নুল আবেদীন, বিচারপতি মোঃ আওলাদ আলী ও

বিচারপতি হায়দার হোসেনের বৃহত্তর বেঞ্চ ত্রয়োদশ সংশোধনী সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় বলে রায় দেন। অর্থাৎ হাইকোর্টের দুই দুইটি বেঞ্চের পাঁচজন বিচারপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেননি।

পরবর্তীতে হাইকোর্টের দ্বিতীয় রায়টির বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা হয় এবং আপিল বিভাগ ১০ মে ২০১১ তারিখে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধান বিরোধী ও ভবিষ্যতের জন্য বাতিল বলে এক পৃষ্ঠার একটি বিভক্ত আদেশ দেন। আদেশে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও জনগণের নিরাপত্তা সর্বোচ্চ আইন বলে দাবি করে বিচারবিভাগকে সম্পৃক্ত না রেখে আরও দুই টার্মের জন্য সংসদ ইচ্ছা করলে এটি অব্যাহত রাখার পক্ষে পর্যবেক্ষণ দেন। শোনা যায়, ৪-৩ সংখ্যাগরিষ্ঠার ভিত্তিতে আদেশটি দেওয়া হয়। অর্থাৎ হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের মোট যে ১২ জন বিচারপতি তত্ত্বাবধায়ক ইস্যুতে রায় দেন, তার আটজনই (হাইকোর্ট বিভাগের দুই বেঞ্চের পাঁচজন এবং আপিল বিভাগের তিনজন) এর পক্ষে অবস্থান নেন, যদিও আপিল বিভাগে সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে পদ্ধতিটি বাতিল হয়ে যায়।

এছাড়াও আপিল বিভাগে মামলার শুনানীকালে ১২ জন জেষ্ঠ আইনজীবী – বিচারপতি টিএইচ খান, ড. কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার রফিকুল হক, ড. এম জহির, জনাব মাহমুদুল ইসলাম, ব্যারিস্টার আমির উল ইসলাম, ব্যারিস্টার রোকনুদ্দিন মাহমুদ, ব্যারিস্টার আজমালুল হোসেন কিউসি – অ্যামিকাস কিউরির ভূমিকা পালন করেন। এসব জেষ্ঠ আইনজীবীদের সবাই, আজমালুল হোসেন কিউসি ব্যতীত, তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাখার পক্ষে মত দেন। এমনকি রাষ্ট্রের কৌশূলী হিসেবে এটর্নি জেনারেলও একই অবস্থান নেন। অর্থাৎ আমাদের বার ও বেঞ্চের অধিকাংশই তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাখার পক্ষে।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০১০ সালের জুলাই মাসে সংসদ উপনেতা বেগম সাজেদা চৌধুরীর নেতৃত্বে সংবিধান সংশোধনের লক্ষে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি সংসদীয় বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়, যাতে বিএনপি অংশগ্রহণ করেনি। কমিটি তিনজন সাবেক প্রধান বিচারপতি, ১১ জন শীর্ষ আইনজীবী ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ, ১৮ জন বুদ্ধিজীবী, ১৮টি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদক বা জেষ্ঠ সাংবাদিক, কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও সেক্টরস কমাণ্ডারস ফোরামের নেতৃবৃন্দের মতামত নেয়, যার মধ্যে বর্তমান লেখকও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। বিশেষজ্ঞ এবং বিশিষ্ট নাগরিকদের প্রায় সকলেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং কেউই এর বিরোধীতা করেননি। এমনকি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলের সুপারিশ করেনি। তা সত্ত্বেও ৩০ জুন ২০১১ তারিখে উচ্চ আদালতের রায়ের দোহাই দিয়ে, পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধান থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাদ দেওয়া হয়।

শুধু বিশেষজ্ঞ মতামতই নয়, সাধারণ নাগরিকদের অধিকাংশও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার পক্ষে। উদাহরণস্বরূপ, গত ১৮ মে ২০১২ তারিখে প্রথম আলো পরিচালিত জরিপে 'তত্ত্বাবধায়করূপী দানব আর মানুষ দেখেতে চায় না' – প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যর সাথে আপনি কি একমত? প্রশ্নের উত্তরে ৬,৪৯৩ জন অংশগ্রহণকরীর মধ্যে ৮৬.৪২ শতাংশই 'না' উত্তর দেন। 'হ্যাঁ' উত্তর দিয়েছেন মাত্র ১২.৮৮ শতাংশ। এ বছরের প্রথম দিকে যুগান্তর কর্তৃক পরিচালিত জরিপে,'বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া বলেছেন, নির্দলীয় বা অন্তবর্তীকালীন সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে' – এ বক্তব্য সম্পর্কে মতামতদানকারী ১১,৩১৬ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৭০ শতাংশই এর সাথে একমত পোষণ করেন। একইভাবে *প্রথম আলোর* সাম্প্রতিক (২৪ আগস্ট ২০১২) অনলাইন জরিপের 'রাজনৈতিক দলের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না, তা ঠিক নয়' প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যের সঙ্গে কি আপনি একমত?' – এ প্রশ্নের জবাবে ৬,৮৯৯ জন উত্তরদাতার মধ্যে 'না' উত্তর দেন ৫,৫৬৬ জন, 'হ্যাঁ' ১২৮৫ জন এবং মন্তব্য নেই ৪৮ জন। অর্থাৎ ৮১ শতাংশ উত্তরদাতা বিশ্বাস করেন না যে, দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে। অনলাইন জরিপের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এর থেকে জনমত সম্পর্কে একটি তথ্যভিত্তিক ধারণা পাওয়া যায়।

তবে সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রায় পাঁচ হাজার নির্বাচন বর্তমান সরকারের অধীনে নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ সরকার নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছে। তাই দশম সংসদ নির্বাচন সম্পর্কেও তাদেরকে বিশ্বাস করা যায়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এ দাবির মাধ্যমে সরকার তিনটি বিষয়ে জনগণের চোখে ধূলা দেওয়ার চেষ্টা করছে। প্রথমত, জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন দুটি ভিন্ন জিনিষ। কারণ স্থানীয় সরকার নির্বাচনে হারলেও ক্ষমতার রদবদল হয় না। পক্ষান্তরে জাতীয় নির্বাচনে হারলে মন্ত্রী-এমপি হওয়ার সুযোগ হাতছাড়া হয়, যার তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। ক্ষমতা হারালে কিংবা ক্ষমতায় না গেলে বিভিন্ন ধরনের ফায়দা (যেমন, ট্যাক্স-ফ্রি গাড়ি, আবাসিক এলাকায় প্লট ইত্যাদি) এবং সুযোগ-সুবিধা (যেমন, ব্যাংক লাইসেন্স, টেলিভিশন চ্যানেল ইত্যাদির মতো ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধা) পাওয়ার ও দেওয়ার সুযোগ হয়।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, ক্ষমতায় গেলে আইন ও শিষ্টাচার বহির্ভূতভাবে লুটপাটতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, এমনকি যা-ইচ্ছা-তাই করা যায়। গত চারদলীয় জোট এবং বর্তমান মহাজোট সরকারের দিকে তাকালে এব্যাপারে কোনো সন্দেহই থাকার কথা নয়। যেমন, বর্তমান সরকারের দুই দুইজন মন্ত্রীর এবং একজন উপদেষ্টার বিরুদ্ধে গুরুতর দুর্নীতির অভিযোগ উঠলেও, তাদের দুজনের মধ্যে একজন এখনও স্ব-পদে বহাল আছেন। তাই তো ছলে-বলে-কলে-কৌশলে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য দলগুলো মরিয়া।

দ্বিতীয়ত, আমাদের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ক্ষমতায় যাওয়া-না-যাওয়ার ওপর রাজনৈতিক অস্তিত্ব, এমনকি জীবনের নিরাপত্তাও নির্ভর করে। চারদলীয় জোট সরকারের আমলে বেশ কয়েকজন রাজনীতিবিদের প্রাণহানি এবং শেখ হাসিনার জীবনের ওপর হামলা এর জঘন্যতম উদাহরণ। দুর্ভাগ্যবশত, রাজনৈতিক হত্যা-গুম বর্তমান সরকারের আমলেও চলছে এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নগ্নভাবে বিরোধী দলের উপর দমন-পীড়ন। তাই যেকোনো মূল্যে ক্ষমতায় যাওয়া এবং তা আকড়ে ধরে থাকা আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রধান লক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তৃতীয়ত, স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়ে যে নির্বাচন কমিশন ছিলো সে কমিশনের সঙ্গে বর্তমান কমিশনের পার্থক্য অনেক। শত প্রতিকূলতার মুখেও হুদা কমিশন স্বাধীনচেতা মনোভাব নিয়ে নিরপেক্ষতার সঙ্গে কাজ করার চেষ্টা করেছে, যদিও শতভাগ সফলতা তারা অর্জন করেনি। তবে বর্তমান কমিশন এরই মধ্যে অনেকগুলো বিতর্কিত বক্তব্য দিয়ে জনমনে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। (যেমন, আর কোনো সংস্কারের বা তাদেরকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা নেই। জনগণ পঞ্চদশ সংশোধনী মেনে নিয়েছে ইত্যাদি।) এছাড়াও যে অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে বর্তমান কমিশনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, সে কমিটির গঠন এবং বর্তমান কমিশনের কয়েকজনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। যেমন, কমিশনের দুইজন সদস্য ১৯৭৩ সালের প্রশাসনিক ক্যাডারের (বিখ্যাত সেভেনটি-থ্রি ব্যাচের) কর্মকর্তা ছিলেন এবং তাঁরা গত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে বঞ্চিতও হয়েছিলেন। এদের একজন কমিশনে নিয়োগ প্রাপ্তির সময়ে প্রচারিত জীবনবৃত্তান্তে নিজেকে ১৯৭১ সালে 'মুজিব বাহিনীর সদস্য' বলে দাবি করেছেন। এধরনের ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত কমিশনের পক্ষে নির্বাচনের সময়ে, সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সরকারকে সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করতে বাধ্য করা সম্ভব হবে কি না সে ব্যাপারে অনেক নাগরিকেরই সন্দেহ রয়েছে।

পঞ্চদশ সংশোধনী বহাল থাকলে অন্তবর্তীকালীন সরকারের অধীনে পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে। যেহেতু দলীয় ব্যক্তিদের নিয়েই অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠিত হবে, সে সরকার নিরপেক্ষভাবে আচরণ করতে সক্ষম হবে না। তারা পক্ষপাতদুষ্ট প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ব্যবহার করে নির্বাচন প্রভাবিত করতে পারবে।

আমাদের গত দুই দশকের নির্বাচিত সরকারগুলোর একটি বড় 'অবদান' হলো ফায়দাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা – পরিবারের সদস্য ও দলীয় ব্যক্তিদেরকে এবং প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে বিভিন্ন ধরনের অযাচিত সুযোগ-সুবিধা প্রদান। আরেকটি বড় অবদান হলো প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দলীয়করণ, যা গত দুই সরকারের আমলে চরম আকার ধারণ করেছে। আর ফায়দাতন্ত্র ও দলতন্ত্রের ফলে সরকারের 'আপনজনরা' চরম অন্যায় করেও পার পেয়ে যায়, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তারা পুরস্কৃতও হয়।

ফায়দাতন্ত্র ও দলতন্ত্রের মাধ্যমে আমাদের সরকারগুলো প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে তাদের লাঠিয়াল হিসেবে ব্যবহার করে। আর এ লাঠিয়ালদের মাধ্যমেই সরকার বিরোধী দলকে বিভিন্নভাবে হয়রানি ও শায়েস্তা এবং তাদের কর্মসূচি ব্যাহত করে। উদাহরণস্বরূপ, গত ১২ মার্চ নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকারের দাবিতে বিএনপি ঢাকায় একটি মহা সমাবেশের ডাক দেয়। সরকার প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে সারা দেশের সঙ্গে ঢাকার যোগাযোগ বহুলাংশে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, যাতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীরা সমাবেশে যোগ না দিতে পারে। বস্তুত, সরকারের পক্ষ থেকে একটি অঘোষিত হরতাল পালিত হয়। এছাড়াও সমাবেশে তিনটি বেসরকারি টেলিভিশনের – একুশে টিভি, বাংলা ভিশন ও ইসলামিক টিভির সরাসরি সম্প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরই ছোট আকারে পুনরাবৃত্তি ঘটে ১১ জুন ২০১২ তারিখে। বিরোধী দলের সমাবেশ পণ্ড করার জন্য যদি সরকার প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এমন অপব্যবহার করতে পারে তাহলে নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে – যে নির্বাচনের উপর ক্ষমতায় গিয়ে পাঁচ বছরের জন্য লুটপাটের ইজারা প্রতিষ্ঠা, এমনকি ভবিষ্যত নিরাপত্তা নির্ভর করে – সরকার যা কিছুই করতে পারে।

বিরোধী দলকে দমন-পীড়ন চালানোর জন্য পক্ষপাত দুষ্ট আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও নিু আদালতকে কীভাবে কাজে লাগানো যায় তার আরেকটি জলন্ত উদাহরণ সম্প্রতি সৃষ্টি হয়েছে। কয়েকমাস পূর্বে বিরোধী দলের ডাকা হরতালের প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রীর অফিসের কাছাকাছি গাড়ীতে অগ্নি সংযোগে মদদ দেওয়ার জন্য বিরোধী দলের ৪৬ জন শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা এবং তাঁদেরকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর অনেকটা সুপারসনিক গতিতে, মূল অগ্নিসংযোগকারীদের খুঁজে বের না করেই, তাদের বিরুদ্ধে চার্জসীট দেওয়া ও তা গৃহিত হয় এবং দ্রুত বিচার আদালতে বিচার শুরু হয়, যদিও মাসের পর মাস পার হয়ে গেলেও পুলিশ সাগর-রুনি হত্যাসহ অনেকগুলো স্পর্শকাতর মামলায় কোনো অগ্রগতিই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দেখাতে পারেনি। সম্প্রতি আবার ১৩ জন বিরোধী দলীয় নেতাকে সচিবালয়ে ককটেল ফোটানোর জন্য অভিযুক্ত করা হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষপাতিত্ব যে কী নগ্ন রূপ নিয়েছে তা স্পষ্ট হয় বিরোধী দলের চীফ হুইপ জয়নাল আবেদিন ফারুকের ওপর গত .তারিখের পুলিশ নির্যাতনের কোনো প্রমাণ তদন্তকালে পুলিশ পায়নি, যদিও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বদৌলতে সারা দেশব্যাপী তা প্রত্যক্ষ করেছিলো।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবিত সর্বদলীয় সরকারের অধীনেও নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্ভব নয়, এমনকি বিরোধী দলকে মন্ত্রীসভার অর্ধেক আসন এবং বেগম খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী পদ দিলেও নয়। এর পেছনে দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, ফায়দাতন্ত্র ও দলবাজিতে লিপ্ত প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী – যদি তাদের মধ্যে ব্যাপক শুদ্ধি অভিযান চালানো না হয়, যা করার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ – তাদের নিজেদের স্বার্থেই নির্বাচনকে পক্ষপাতদুষ্ট করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, পঞ্চদশ সংশোধনী বজায় রেখে, নির্বাচন হলে বর্তমান সংসদ সদস্যরা নির্বাচনকালে বহাল থাকবেন। বর্তমানে সরকারি দলের, বিশেষত আওয়ামী লীগ মনোনীত সংসদ সদস্যদের অধিকাংশই তাঁদের নির্বাচনী এলাকায় অনেকটা নব্য জমিদারের ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের অনেকে থানা-পুলিশ থেকে শুরু করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করেন। এমনকি তাঁদের কিংবা দলীয় নেতা-নেত্রীদের সবুজ সংকেত ছাড়া পুলিশ কারো কাছ থেকে মামলা পর্যন্ত নেয় না এবং চার্জসিটও দেয় না। অর্থাৎ তৃণমূলে বর্তমানে এক ধরনের 'পেট্রন-ক্লায়েন্ট' বা দাতা-গ্রহিতার সম্পর্ক বিরাজমান।

এমনি পরিস্থিতিতে পদে বহাল থাকা সরকারি দলের সংসদ সদস্যরা তাদের পদ ব্যবহার করে নির্বাচন প্রভাবিত করতে পারবেন। এমনকি থানা-পুলিশকে ব্যবহার করে মামলা-হামলার মাধ্যমে বিরোধী দলের প্রার্থীদেরকে এলাকা ছাড়াও করতে পারেন। এ অবস্থায় ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে বর্তমান সংসদ সদস্যদেরকে বাদ দিয়ে নতুনদেরকে মনোয়ন দেওয়াও সহজ হবে না। তাই বর্তমান সংসদ সদস্যদেরকে পদে বহাল রেখে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

এছাড়াও সমঅংশিদারিত্বের ভিত্তিতে, এমনকি খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে গঠিত নির্বাচনকালীন সর্বদলীয় সরকারের পক্ষে কার্যকারিতা প্রদর্শন দূরুহ হয়ে দাঁড়াবে। যদিও আমাদের সংবিধান প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান নির্বাহীর সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে প্রধানমন্ত্রীসর্বস্ব সরকার ব্যবস্থা সৃষ্টি করে [অনুচ্ছেদ ৫৫(২)], তবুও নির্বাচনের সময়ে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে গঠিত সরকার ব্যবস্থায় বিরোধী দলের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিরোধীতার কারণে তার পক্ষে এ ধরনের একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রয়োগ অসম্ভব হয়ে পড়বে। এমনকি সমঅংশগ্রহণের ভিত্তিতে গঠিত সর্বদলীয় মন্ত্রীসভার পক্ষে বিপরীতমুখী স্বার্থের দ্বন্দ্বের কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতে পারে। বস্তুত এধরনের ব্যবস্থা একটি নপুংসক সরকরের সৃষ্টি করতে পারে, যা ভবিষ্যতে আরও নতুন সংকটের জন্ম দেবে।

টেবিল ২: নির্বাচনকালীন সময়কার বিকল্প সরকার ব্যবস্থা

বৈশিষ্ট্য	প্রথাগত অন্তবর্তীকালীন সরকার	প্রধানমন্ত্রী প্রস্তাবিত অন্তবর্তীকালীন/ সর্বদলীয় সরকার	১৯৯৪ সালে বিরোধীদল প্রস্তাবিত অন্তবর্তীকালীন সরকার	ত্রয়োদশ সংশোধনীর তত্ত্বাবধায়ক সরকার	মন্তব্য
সময়কাল	সংসদের মেয়াদ শেষে মন্ত্রীসভা পদত্যাগের পর পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত	সংসদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বের তিন মাসকালে	সংসদের মেয়াদ শেষে মন্ত্রীসভা পদত্যাগের পর পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত (অন্তত আগামী তিন টার্মের জন্য)	সংসদের মেয়াদ শেষে মন্ত্রীসভা পদত্যাগের পর পরবর্তী ৯০ দিনের জন্য	প্রধানমন্ত্রী প্রস্তাবিত সর্বদলীয় সরকার প্রথাগত অন্তবর্তীকালীন সরকারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়
সরকার প্রধান	বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী	সম্ভবত বিদায়ী প্রধান মন্ত্রী	বিএনপির প্রস্তাবানুযায়ী বিদায়ী প্রধান মন্ত্রী; বিরোধী দলের প্রস্তাবানুযায়ী নির্দলীয় ব্যক্তি	নির্দলীয় ব্যক্তি (সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বা..)	কে সরকার প্রধান হবেন এ ইস্যুতেই সমঝোতা প্রচেষ্টা ভেঙ্গে যায়
মন্ত্রীসভা/ উপদেষ্টা পরিষদের সংখ্যা	পুরো বিদায়ী মন্ত্রীসভা	অনির্ধারিত	অনির্ধারিত	প্রধান উপদেষ্টাসহ ১১ জন	পরাজিত দল নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তুললেও

					তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে সাধারণ জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে
মন্ত্রীসভায় বিরোধী দলের অংশগ্রহণ	থাকে না	অনির্ধারিত সংখ্যক বিরোধী দলের প্রতিনিধি থাকবে	থাকবে না	ছিলো না	
নির্বাচন কমিশন	নিরপেক্ষ বলে ধরে নেওয়া হয়	নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠা শুরু হয়েছে	পুনঃগঠনের প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত ছিলো	নিরপেক্ষ ছিলো বা পুনঃগঠন করা হয়েছে	বর্তমান কমিশন এ পর্যন্ত জনগণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়নি
প্রশাসন	নিরপেক্ষ বলে ধরে নেওয়া হয়	পক্ষপাত দুষ্ট	নিরপেক্ষতা ব্যাপকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ ছিলো না	নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়ে ছিলো	ক্ষমতাসীন দলের প্রতি আনুগত্য একটি বিরাট সমস্যা
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী	নিরপেক্ষ বলে ধরে নেওয়া হয়	পক্ষপাত দুষ্ট	নিরপেক্ষতা ব্যাপকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ ছিলো না	নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়ে ছিলো	ক্ষমতাসীন দলের প্রতি আনুগত্য একটি বিরাট সমস্যা

প্রসঙ্গত, নির্বাচনকালীন সময়ে সরকারি দলের পক্ষ থেকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরোধীতার পেছনে আরেকটি যুক্তি হলো যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অনির্বাচিত ব্যক্তিদের শাসনকার্যে সম্পৃক্ত হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। দুভাগ্যবশত বর্তমান সরকারের আমলেই মন্ত্রীসভার সদস্যদের ওপর অনির্বাচিত উপদেষ্টাদের খবরদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জেলা পরিষদে অনির্বাচিত দলীয় ব্যক্তিদেরকে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছে। একইভাবে ঢাকা সিটি করপোরেশনকে বিভক্ত করে দুইজন অনির্বাচিত সরকারি কর্মকর্তাকে প্রশাসকের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।
এমনি পরিস্থিতিতে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য, অন্তত আগামী দুই টার্মের জন্য, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারে বিকল্প নেই বলেই অনেকের ধারণা, যদিও এটির সংস্কার আবশ্যক। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে অতীতের তত্ত্বাবধায়ক সরকারগুলো দুটি বড় অবদান রেখেছিলো, যার একটি ছিলো নির্বাচন কমিশনকে বিনা দ্বিধায় সব ধরনের সহায়তা প্রদান করা। আরেকটি অবদান ছিলো প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে দলীয় ব্যক্তিদের নিয়ে সাজানো বাগান ভেঙ্গে দিয়ে নতুনদেরকে পদায়ন করা এবং একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে সংশ্লিষ্ট সবাই নিরপেক্ষভাবে আচরণ করতে পারে, যা দলীয় বা সর্বদলীয় সরকারের পক্ষে করা সম্ভব নয়।

তবে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী উচ্চ আদালতকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বাইরে রাখতে হবে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নিরপেক্ষ ব্যক্তি খুঁজে বের করা – যদিও অনেক যোগ্য ও নির্দলীয় ব্যক্তি আমাদের সমাজে এখনও আছেন – অতি দুরূহ। কারণ দেশে বিরাজমান চরিত্র হননের অপসংস্কৃতির কারণে প্রায় প্রত্যেক সম্মানিত ব্যক্তির পেছনেই দলীয় লেবেল এঁটে দেওয়া হয়েছে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য তাই একটি গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি আমাদেরকে বের করতে হবে, যার মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টাসহ উপদেষ্টা পরিষদের সম্ভাব্য সদস্যদের নাম চিহ্নিত করা যেতে পারে।

সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদীয় বিশেষ কমিটির সামনে এ সম্পর্কে বর্তমান লেখক একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল। প্রস্তাবটি ছিলো **সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত সব বিচারপতিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা, যার সভাপতি হবেন সবার আগে অবসরে যাওয়া প্রধান বিচারপতি। এই কমিটি সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে একজন প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্যান্য উপদেষ্টাদের নিয়োগের জন্য ১৫ সদস্যের একটি প্যানেল তৈরি করবেন, যে প্যানেল থেকে প্রধান উপদেষ্টা ১০ জন উপদেষ্টা নিয়োগ দেবেন। অর্থাৎ সাবেক অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগণ একটি অনুসন্ধান কমিটির ভূমিকা পালন করবেন। এ অনুসন্ধান কমিটিতে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর একজন করে প্রতিনিধি যুক্ত করা যেতে পারে। একই সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলো একটি চুক্তি স্বাক্ষর করবেন, যাতে আগামী দুই টার্মের পরে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষে ক্ষমতায় গিয়ে তারা কী কী সংস্কার করবেন তা লিপিবদ্ধ থাকবে, কারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা একটি স্থায়ী সমাধান নয়। এছাড়াও এতে থাকবে নব্বইয়ের 'তিন জোটের রূপরেখা'র মতো নির্বাচনকালীন সময়ের জন্য একটি আচরণবিধি।**

আমার প্রস্তাবটি উত্থাপনের উদ্দেশ্য অন্যদেরকেও তাদের নিজেদের সুপারিশ নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য উৎসাহিত করা, যার ভিত্তিতে একটি গ্রহণযোগ্য ফর্মুলা বের হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। তবে যে ফর্মুলাই বের করা হউক না কেন, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বর্তমান আকারে বহাল রেখে এবং পক্ষপাতদুষ্ট প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মাঠে রেখে কারো পক্ষেই নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়।

আমাদের দেশে নির্বাচন ও গণতন্ত্র সমার্থক হয়ে গিয়েছে। নির্বাচন পরবর্তীকালে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির চর্চা ও সুশাসনের অভাবই মূলত এর জন্য দায়ী। তাই ভবিষ্যতে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথও যদি রূদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে আমাদের আর থাকলো কী? এভাবেই কী আমরা নিজেদেরকে গণতান্ত্রিক যাত্রাপথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলবো?